খোরাসান থেকে প্রকাশিত
বিশ্বব্যাপী জিহাদের প্রতি আহ্বানকারী ম্যাগাজিন 'হিত্তিন, ইস্যু- ১' এর প্রবন্ধ অনুবাদ

যাদেরকে দেখে আল্লাহর কথা স্মরণ হয়...

[শাইখ সাঈদ (মুস্তফা আবু ইয়াযিদ) রহিমাহুল্লাহ'র জীবনী]

উস্তাদ আহমাদ ফারুক
রহিমাহুল্লাহ

النصر
AN-NASR

যাদেরকে দেখে আল্লাহর কথা স্মরণ হয়...

[শাইখ সাঈদ (মুস্তফা আবু ইয়াযিদ) রহিমাহুল্লাহ'র জীবনী]

উস্তাদ আহমাদ ফারুক রহিমাহুল্লাহ

সূচিপত্র

জীবনে এমন মানুষ খুব কমই দেখেছি যারা তাকওয়া, ইখলাস, অন্তরের পরিশুদ্ধতা, ঈমানী বিচক্ষণতা, উন্নত চরিত্র, উন্নত রুচিবোধ, দুনিয়া বিমুখতা, অল্পে তুষ্টি, উম্মতের প্রতি দরদ-ব্যথা, বাহাদুরি, ইলমের প্রতি ভালোবাসার ক্ষেত্রে শাইখ সাঈদ (মুস্তফা আবু ইয়াজিদের) মত। তাকে দেখে মনে হত তিনি এই যুগের লোক না। বরং আমাদের মাঝে বিচরণকারী কোন পূর্বসূরি।

একজন আমীর, শিক্ষক, উস্তাদ, মুরুব্বি ও স্নেহশীল পিতা!

ইসলামি বিশ্বের জ্ঞান ও সভ্যতার কেন্দ্র মিশরের অধিবাসী এই সম্মানিত ব্যক্তির সাথে আমার সম্পর্ক শুধু আমীর-মামুরের নয়। বরং তিনি আমার জন্য একজন উস্তাদও ছিলেন। আমার মুরুব্বি ছিলেন এবং রূহানী পিতাও ছিলেন। আসলে প্রত্যেক আমীরের তার মামুরের সাথে এমন সম্পর্কই হওয়া উচিৎ। মাওলানা আবুল কালাম আজাদ রহ. সমাজের মধ্যে আমীরের অবস্থান নিয়ে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি কথা বলেছেন। তিনি মামুরের ক্ষেত্রে আমিরের নির্দেশের 'শোনা ও আনুগত্য করা'র অর্থ এবং কুরআন হাদিসে এর আলাদা আলাদা উল্লেখের হেকমত বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন:-

১. জামাতের মধ্যে ইমামের অবস্থান হলো যাতার মাঝের খুঁটির মত। আর তার কর্মচারীরা হলো যাতার চাকতির ন্যায়। উম্মত সেই যাতার পাশে ঘোরে। আর যাতা সেই খুঁটির পাশে ঘোরে। মানুষ এই বিশেষ পদ্ধতিতে একত্রিত হওয়ার কারণে জামাত সৃষ্টি হয়। এভাবেই এই জামাত একটি জীবন্ত দেহের আকৃতি ধারণ করে।

২. হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে, 'আসসামউ' – অর্থাৎ 'শোনা'। উদ্দেশ্য হলো উম্মত ইমামের কথা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনবে। এবং দিক-নির্দেশনা গ্রহণ করবে। এই 'শোনা' শব্দ দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায়, আমীর উম্মতের মাঝে শুধু আইন প্রয়োগকারী নয়, বরং সে উম্মতের মুরুব্বী ও মুরশিদও। তাই উম্মতের উপর জরুরী হলো আমীরের কথা মানার নিয়তে মনোযোগ দিয়ে শুনবে, এবং তার কথা দ্বারা দিকনির্দেশনা লাভ করবে'।

আমি পূর্ণ ইয়াকিনের সাথে বলতে পারি শাইখ সাঈদ রহ. তার অধীনস্থদের কাছে এই ধরণের আমীরের মর্যাদার অধিকারী ছিলেন।

হৃদয় সিক্তকারী প্রথম সাক্ষাত

আমি সর্ব প্রথম ২০০৫ সালের শুরুর দিকে উত্তর ওয়াজিরিস্তানের মীর আলি এলাকায় শাইখের সাথে সাক্ষাত লাভে ধন্য হই। আমার মুহতারাম উস্তাদ জিহাদি কবি শহিদ আহসান আজিজ রহ. এর শাইখের সাথে সাক্ষাতের কথা ছিল। উস্তাদে মুহতারাম আমাকে বললেন, "চল"। শাইখের সাথে তখন আল কায়দার সামরিক শাখার আমীর শাইখ খালেদ হাবীব রহ. সহ আরো কিছু মুজাহিদ নেতা ছিলেন। এটা তখনকার কথা, যখন পর্যন্ত ওয়াজিরিস্তানে মুজাহিদরা দুর্বল ছিল। আর পাকিস্তানি সেনাদের শক্তি শক্তিশালী ছিল।

মুজাহিদরা দিনে ঘরে থাকতেন। রাত হলে কাজে, সাক্ষাতে বের হতেন। আমরাও শাইখের সাথে রাতে দেখা করতে বের হলাম। আবার রাতেই ফিরে আসার দরকার ছিল। সুতরাং মোলাকাত সংক্ষিপ্ত হলো এবং পরস্পর পরিচয় পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল কিছুটা। শাইখের জাদুময় ব্যক্তিত্ব প্রথম সাক্ষাতেই মন কেড়ে নিলো। শাইখের বয়স তখন পঞ্চাশের কিছু বেশি ছিল। মেহেদির ফাকে ফাকে চমকানো সাদা দাড়ি শাইখের বয়স কে জানান দিচ্ছিল। শাইখের মাথায় সাদা পাগড়ি শোভা পাচ্ছিল। শাইখের ব্যক্তিত্বের সাথে পাগড়িটা খুব মানানসই ছিল। তার কাঁধে ছিল বন্দুক, আর ধবধবে সাদা জামার উপর কালো কোট পরিহিত ছিলেন।

পরবর্তীতে যখন শাইখের সাথে দীর্ঘ সময় কাটানোর সুযোগ হয়েছে, তখন শাইখকে খুব পরিচ্ছন্ন পেয়েছি। শাইখের পা থেকে মাথা পর্যন্ত দুনিয়া বিমুখতা ও অমুখাপেক্ষিতার ছাপ থাকতো। তা স্বত্বেও সর্বদা ধবধবে সাদা পোশাক পরতে দেখেছি। আমাদের আসলাফদের অনেকে এমন ছিলেন, তারা নিজেদের অভাবের কথা কাউকে বুঝতে দিতেন না। কুরআনে বর্ণিত গুণ তাদের মাঝে পাওয়া যায়।

বেশি সেজদার কারণে তার কপালে স্পষ্ট দাগ পড়ে গিয়েছিল। সর্বদাই চেহারায় একটি মায়াবী হাসি লেগে থাকত। খুব ধীরে ধীরে বিশুদ্ধ আরবিতে কথা বলতেন। অপরের কথাও খুব মনোযোগ দিয়ে শুনতেন। কারও কথা কাটতেন না। কোন বিষয়ে যদি ভিন্ন মতও পোষণ করতেন তাহলেও মনে হত না যে, তিনি ভিন্নমত পোষণ করছেন। এমন নরম ভাবে কথা বলতেন যে, তার কথা এমনিতেই অন্তরে বসে যেত।

শাইখের সাথে এভাবেই সম্পর্ক শুরু হয়েছিল। এরপর তাকে খুব কাছ থেকে দেখা, সফরে-বাড়িতে তার সাথে থাকা, কঠিন দিনগুলিতে তার সাথে অবস্থান করার মাধ্যমে শাইখের কাছ থেকে অনেক কিছু শেখার সুযোগ পেয়েছি। শাইখের সাথে থাকা সময়গুলো আমার জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সময়। আমার মত ব্যক্তির তো শাইখকে জীবনে একবার দেখাই সৌভাগ্য ছিল। কিন্তু আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীতে অনেক দীর্ঘ সময় শাইখের সাথে কাটিয়েছি। এজন্য যতই শুকরিয়া আদায় করি তা কম হবে।

বাড়াবাড়ি থেকে মুক্ত, দ্বীনের স্পষ্ট বুঝ

যখন শাইখের সাথে সাক্ষাত হয়েছিল তখন তিনি শাইখ উসামা বিন লাদেন রহ. ও শাইখ আইমান জাওয়াহিরি হাফিজাহুল্লাহ এর পর খোরাসানের আল কায়েদার কেন্দ্রীয় জিম্মাদার ছিলেন। কার্যত আল কায়দার সাথে সম্পৃক্ত সামরিক, দাওয়াতি ও পরিচালনাগত সব বিষয় তার কাছে আসত। সুতরাং তিনি আমাদের জন্যও আমীরের স্থানে ছিলেন। আর আমরা অধিকাংশ জিহাদি বিষয়ে তার কাছেই যেতাম।

শাইখের সাথে আমাদের লম্বা বৈঠক সর্ব প্রথম ২০০৫ সালে হয়েছে। তখন আমি একটি মারকাজে অবস্থান করছিলাম। আমার সাথে এমন কিছু সাথী ছিল, যারা তাকফীরের ক্ষেত্রে খুব বাড়াবাড়ি করতো। তারা তাদের এই মতাদর্শ প্রচারও করেছিল। দ্বীনি জামাতগুলো তাদের মূল টার্গেট ছিল। সাথীরা তাদের ব্যাপারে খুব বাড়াবাড়ি করত এবং তাদের বিরুদ্ধে ফতোয়া দিতে খুব মজা পেত।

আমার এই অবস্থায় খুব কষ্ট হচ্ছিল। আমি চাইলাম এই বিষয়গুলো সব আমীরদের সামনে তুলে ধরব। তাই শাইখ আহসান আজিজ রহ. ও আমি শাইখ সাঈদ রহ. এর সাথে সাক্ষাত করলাম এবং সব ঘটনা তুলে ধরলাম। শাইখ তাদেরকে ডেকে খুব ধমকালেন, এবং শাইখ আবুল ওয়ালিদ ও অন্যান্য আলেমদের সামনে বসালেন। তাদের একজন শাইখের সামনে তার মতামত থেকে তওবা করল আরেকজন নিজের মতে অটল রইল। তাই শাইখ তাকে জামাত থেকে বের করে দিয়ে তার দেশ ইরাকে পাঠিয়ে দিলেন।

উম্মতের ব্যথায় দগ্ধ পবিত্র হৃদয়

ঠিক এমনই একটি ঘটনা এর কিছুদিন পরেই হয়েছে। মেহসুদ এলাকার শেকতুই নামক জায়গায় একটি মারকাজের জিম্মাদার ছিলেন শাইখ ইহসানুল্লাহ মিছরী রহ.। তার মারকাজে আমাকে একটি কোর্স করানোর জন্য পাঠানো হয়েছিল। কিছুদিন পর শাইখ ইহসানুল্লাহ সেখান থেকে চলে গেলেন। তার জায়গায় আরেকজন শাইখ জিম্মাদার হলেন। তিনি কিছু মাসআলায় হেকমত অবলম্বন করেন নি। স্থানীয় আলেমদের সাথে তর্ক বিতর্কে লিপ্ত হয়ে গেলেন।

মেহসুদ এলাকায় হানাফি মাযহাব মানা হয়। আর জুমার নামাজের জন্য হানাফি মাযহাবের শর্ত দূর-দূরান্তের গ্রামে পাওয়া যেত না, তাই সেখানে জুমা হত না। শাইখ স্থানীয় আলেমদের সাথে বিবাদে জড়ালেন কেন এসমস্ত জায়গায় জুমা হয় না। জুমা পড়তে হবে। এ নিয়ে একটা পেরেশানির অবস্থা সৃষ্টি হল। দুই পক্ষ থেকে দলিল পেশ করা শুরু হল। আমি যখন শাইখ সাঈদ রহ. এর সাথে সাক্ষাতের সুযোগ পেলাম, তখন আমি তাকে সব বললাম। তিনি সাথে সাথে সেই উস্তাদকে সরিয়ে নিয়ে অন্য একজনকে নিয়োগ করলেন। অথচ আমি একদম নতুন ছিলাম। আর সেই উস্তাদ কয়েক বছর যাবত ময়দানে ছিলেন।

এই দুই ঘটনা আমার কাছে স্পষ্ট করে দিল যে, আল কায়দার কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব সব ধরণের বাড়াবাড়ি মুক্ত। আল কায়েদা একটি পরিচ্ছন্ন, ভারসাম্যপূর্ণ বুঝের অধিকারী এক জামাত। উম্মতের কল্যাণ ও এই স্তরে দ্বীনের চাহিদাকে খুব ভালোভাবে জানেন। তাই তারা মাযহাবি গোঁড়ামি, এবং দলীয় জীবাণু থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। এ কারণেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা শাইখ উসামা ও তার সঙ্গীদের প্রতি মানুষের অন্তর ঝুঁকিয়ে দিয়েছেন।

আল কায়েদা দেশ, ভাষা, বংশ, মাসলাক ও দলে বিভক্ত উম্মতকে আবার কিতাব, সুন্নাহ ও কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদের উপর একত্রিত করার দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে নিয়েছেন। আমি আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি - আমি যত বুজুর্গদের সাথে, বিশেষ করে শাইখ সাঈদ, আবু ইয়াহয়া, আতিয়্যাতুল্লাহ, আব্দুল্লাহ সাঈদ, আবুল ওয়ালিদ, খালেদ হাবিব, মনছুর শামী, উসামা কিনী রহ. প্রমুখদের সাথে যত সময় কাটিয়েছি, আমি এই হযরতদেরকে কোন প্রকার বিভাজন ছাড়া, সমস্ত উম্মতের প্রতি ভালোবাসা পোষণ করা, সব ধরণের গোঁড়ামি থেকে মুক্ত থাকার ক্ষেত্রে

দ্বীনের অন্যান্য মেহনতে ব্যস্ত আলেমদের থেকে বেশি অগ্রগামী পেয়েছি। তাদের অন্তরে দ্বীন ইসলামের ফিকির, উম্মতের চিন্তা এমন ভাবে ছেয়ে ছিল যে, অন্যান্য ইখতেলাফগুলো একদম ভুলে গিয়েছিলেন।

তাদের সাথে বছর বছর অবস্থান করা, সকাল-সন্ধ্যা, সফরে বাড়িতে, সর্বদা পাশাপাশি থাকা স্বত্বেও কোন দিন এমন কোন বাক্যও তারা বলেননি, যা আমার মাযহাব ও মতাদর্শ পরিত্যাগে উদ্বুদ্ধ করে। কখনও আমি কোন ইলমি বিষয় আলোচনা শুরু করলে তারাও গাম্ভীর্যতার সাথে ইনসাফের সাথে নিজেদের মতামত পেশ করতেন। কিন্তু বিপরীত মতের ব্যক্তিকে কোন প্রকার আঘাত করা ছাড়া। লৌকিকতা করে দীর্ঘকাল এমন আচরণ সম্ভব নয়। বরং এটা তাদের বাস্তব মনের অবস্থা ও ইলমি আমলি ক্ষেত্রের প্রাধান্য দেওয়ার পদ্ধতি ছিল। এটা শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম, শাইখ উসামা বিন লাদেন, মোল্লা উমর রহ. এর সোহবতের বরকত ছিল। তারা সর্বদা উম্মতের চিন্তায় চিন্তিত থাকতেন। এই উম্মতই তাদের পরিবার, এটাই তাদের তানযিম, এটাই তাদের মাসলাক ছিল।

শাইখ সাঈদ রহ. আমীর

শাইখ সাঈদ রহ. এর আদেশে ২০০৬ সালে আমরা উত্তর ওয়াজিরিস্তান থেকে দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানে চলে আসলাম। এরপর কয়েক বছর সেটাই আমাদের প্রধান অবস্থানস্থল ও জিহাদের প্রধান ঘাঁটি ছিল। শাইখ রহ. কয়েকদিন পরপরই ওয়ানা আসতেন। আর এদিকে এলেই আমার উপর বিশেষ দৃষ্টি দিতেন। আমাদের মারকাজে থাকতেন। আমাদেরকে নতুন খবর শোনাতেন। অন্যান্য রণাঙ্গনের খবর বলতেন। আমাদের কারগুজারি শুনতেন। তিনি শুনে বিশ্লেষণ করতেন, সামনের পরামর্শ দিতেন। তারপর অন্যান্য মারকাজে সাক্ষাতের জন্য যেতেন। শাইখের আসায় আমাদের মধ্যে নতুন উদ্যমতা কাজ করত।

শাইখ রহ. এর হাতে বাইআত

শাইখের সাথে সম্পর্ক দিনদিন বাড়তে লাগলো। শেষ পর্যন্ত একদিন তিনি সরাসরি আল কায়দার হাতে বাইআতের আহবান করলেন। আমি তারই হাতে শাইখ আতিয়াতুল্লাহের উপস্থিতিতে শাইখ উসামা বিন লাদেন রহ. এর কাছে বাইআত দিলাম এবং আল কায়দার সাথে জিহাদি কাজ করার অঙ্গিকার করলাম।

শাইখ সাঈদ রহ. ও পাকিস্তানের জিহাদ

ঐসময় পাকিস্তানে জামিয়া হাফসার দুঃখজনক ঘটনা সামনে আসল। শাইখের অন্তর রাগ ও কষ্টে ভরা ছিল। তারপর শাইখ উসামা বিন লাদেন রহ. এর মর্মস্পর্শী ভাষণ সে আগুণের তেজ আরো বাড়িয়ে দিলো। শাইখ সাঈদ রহ. অনেক ধৈর্যশীল, সহনশীল, ভদ্র ও নরম মেজাজের মানুষ ছিলেন। খুব উত্তেজনাকর পরিস্থিতিতেও অত্যন্ত ধৈর্য ধারণ করতেন। কিন্তু পর্দানশীন নিরপরাধ মেয়েদের উপর হামলা শাইখকেও অস্থির করে তুলেছিল। এই ঘটনার পর শাইখ তার মনোযোগের বড় একটি অংশ এই দেশে জনগণের উপর চেপে বসা তাগুতদেরকে তাড়ানো এবং পাকিস্তানে শরীয়ত প্রতিষ্ঠার চেষ্টার পিছনে ব্যয় করেছেন। শাইখ নিজের অন্তরের ব্যথা আমাদের অন্তরেও দিয়েছেন এবং আমাদেরকে আমেরিকা ও তার প্রধান সহযোগী পাক সেনাদের বিরুদ্ধে দাওয়াত ও জিহাদ উভয় ময়দানে নামার আদেশ করেছেন।

২০০৮ এর মাঝামাঝি সময় আমরা দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের ওয়ানা থেকে মেহসুদে চলে এলাম। মেহসুদে শাইখের সাথে দেখা সাক্ষাত আরো বেড়ে গেল। এটা সে সময়ের কথা যখন পুরো মেহসুদ থেকে সেনাবাহিনী বের হয়ে গিয়েছিল। সেসময় পুরো মেহসুদ কবিলা আমির বাইতুল্লাহ মেহসুদের নেতৃত্বে ছিল। মুজাহিদরা নির্ভয়ে ঘোরাফেরা করতে পারতো। শাইখ প্রায়ই আমার ঘরে আসতেন এবং একত্রে রাত্রি যাপন করতেন। আমরা শাইখের আসার অপেক্ষায় বসে থাকতাম এবং অনেক প্রশ্ন জমা করে রাখতাম। শাইখ সব শুনে অন্তর প্রশান্তকারী উত্তর দিতেন। পাকিস্তানের জিহাদি আন্দোলনের ব্যাপারে বিস্তারিত বৈঠক হত। তার জন্য প্রশ্নের অনেক বড় তালিকা তৈরি করে রাখতাম। আর শাইখও অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে আমাদের সব উত্তর দিতেন।

শাইখ রহ. একজন মুরুব্বি

এই বৈঠকগুলোতে শুধু জিহাদি বিষয়ই আলোচনা হত না। বরং তিনি সূক্ষ্মভাবে আমাদের তরবিয়তও করতে থাকতেন। অধিকাংশ নামাজের পরই শাইখ নামাজের গুরুত্ব, আল্লাহর সাথে সম্পর্ক, ইখলাস ইত্যাদি বিষয়ে বয়ান করতেন। সুযোগ পেলে আমার তাজবিদের ভুলগুলি ঠিক করতেন। আমার আযান ইকামত

তেলাওয়াতের সব ভুল তিনিই ঠিক করেছেন। তারপর আসল তরবিয়ত তো নিজ আমল দ্বারা করতেন। সুবহানাল্লাহ! তার নামাজ কত সুন্দর ছিল। তার মত সুন্দর নামাজ আদায়কারী আর কাউকে দেখিনি।

দেখা গেছে শাইখ হয়তো সমাজ রাষ্ট্র সম্পর্কে জযবা সৃষ্টিকারী আলোচনার মধ্যে আছেন। এমন সময়ও আযান হলে সাথে সাথে তিনি উঠে যেতেন। যেন তিনি আযানেরই অপেক্ষায় ছিলেন এবং তার মন নামাজেই আটকে ছিল। তারপর গুরুত্ব সহকারে অজু করতেন ও নফল আদায় করতেন। এরপর নামাজ পড়াতেন। তিনি উপস্থিত থাকা অবস্থায় তিনিই নামাজ পড়াতেন। তিনি হাফেজ ছিলেন। তাই তাকে মুজাহিদরা শাইখ হাফেজ নামে অবহিত করত।

তিনি খুব ধীরস্থির ভাবে তেলাওয়াত করতেন। অন্তর প্রশান্তকারী তেলাওয়াত করতেন। প্রত্যেক শব্দ বাক্যের হক আদায় করতেন। মনে হত অর্থ মর্মের প্রতি গভীর মনোযোগ সহকারে তিনি তেলাওয়াত করছেন। রুকু সেজদা কিয়াম সবই লম্বা করতেন। তার পিছনে নামাজ পড়লে বুঝা যেত আল্লাহ-ওয়ালাদের নামাজ চোখের শীতলতা কিভাবে হত। আমার মনে হয় শাইখের কাজ, সিদ্ধান্ত ও সময়ে বরকত হওয়ার রহস্য হলো নামাজের প্রতি তার গুরুত্ব। কারণ যেই ব্যক্তির নামাজ ঠিক হয়ে যায় তার জীবনের সব কাজ ঠিক হয়ে যায়।

সারাদিন বৈঠক, বয়ান, মজলিস সফরের ক্লান্তির পরও তিনি তাহাজ্জুদে উঠে যেতেন। আমার মনে পড়ে না যে, আমি কখনও তাকে তাহাজ্জুদে উঠতে দেখিনি। ব্যস্ততার দরুন যদি তিনি রাত দুইটায়ও ঘুমাতেন তাও ফজরের কমপক্ষে এক ঘণ্টা আগে উঠে নফল আদায় করতেন। এবং দুআ ও তেলাওয়াতে সময় কাটাতেন। তাহাজ্জুদের এমন নজির আমি আর দেখিনি। মোট কথা তার বয়ানের আগে তার আমলই তার নিকটস্থদের জন্য তরবিয়ত ও তাজকিয়ার একটি সামান ছিল।

কুরআনের ঘর

শাইখের কুরআনের সাথে ঈর্ষণীয় সম্পর্ক ছিল। যখন এবং যেখানে সুযোগ পেতেন কুরআন শরীফ খুলে তেলাওয়াতে লিপ্ত হয়ে যেতেন। তিনি তার ঘরের লোকদেরকে কুরআন প্রেমিক বানিয়েছিলেন। তার সন্তানাদিরা সবাই হাফেজ ছিল। শাইখের একজন নিকটতম সাথী আমাকে বলেছেন, তার স্ত্রী একবার রমজান

মাসে শাইখের ঘরে গেল। ঘরে ঢুকেই মনে হলো মৌমাছি গুণগুণ করছে। ঘরের সব জায়গা থেকে হালকা হালকা আওয়াজ আসছিল। ছোট বড় সবাই তেলাওয়াতে মশগুল ছিল।

কথাবার্তার মাঝে শাইখের স্ত্রী ঐ বোনকে জিজ্ঞাসা করলেন দিনে কতটুকু তেলাওয়াত হয় রমজানে। সে বলল – দুই-তিন পারা। একথা শুনে ঘরের সবাই আশ্চর্য হল। সে মহিলা পেরেশান হয়ে বলল, "আমি কি ভুল কিছু বললাম? সবাই এমন আশ্চর্য হলো কেন?" শাইখের স্ত্রী বললেন, "আসলে আমার ছোট বাচ্চাও দিনে দশ পারার কম তেলাওয়াতের কথা কল্পনাও করে না"। শাইখ তাদেরকে এমন ভাবে তৈরি করেছিলেন।

বান্দার হক আদায়ের চিন্তা

শাইখের সাথে চলাফেরা দ্বারা আল্লাহর হকের সাথে বান্দার হকও কিভাবে আদায় করতে হয় তা খুব ভালোভাবে শেখা যেত। তিনি নিজের আমল ও সিরাত দ্বারা দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। তিনি গীবত করতেন না, গীবত সহ্যও করতেন না। মুসলমানদের প্রতি সুধারণা বাড়াবাড়ি পর্যায়ের বেশি ছিল। আমরা যদি তার সামনে কল্যাণকামী হয়ে কারো দোষ বর্ণনা করতাম তাহলে তিনি তা যাচাই করার জন্য জেরা শুরু করতেন। তুমি নিজে শুনেছে? তুমি দেখেছ নাকি কারো কাছে শুনেছ? যার কাছ থেকে শুনেছ সেকি নিজে দেখেছে না সেও কারো কাছে শুনেছে? যে দেখেছে সে কোন শব্দে এই কথা বলেছে? বর্ণনাকারী কতটুকু গ্রহণযোগ্য?

মোটকথা এমন প্রশ্ন শুরু করে দিতেন যে, দোষ বর্ণনাকারী নিজেই আত্মরক্ষার পজিশনে চলে যেত। এজন্য তার আশপাশের মানুষের অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল যে, কোন কথা যাচাই ছাড়া বর্ণনা না করা। মুসলমানদের ব্যাপারে যথাসম্ভব ভালো ধারণা রাখা।

শাইখের আচরণের দ্বারা আমরা বুঝতে পেরেছি, দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা যদি সব কান কথা শুনে তাহলে পুরো দলের মাঝে তার প্রভাব পড়বে এবং অন্তরের পবিত্রতা বাকি থাকবে না।

মুসলমানের রক্তের ব্যাপারে সতর্কতা

শাইখের অন্তরে সর্বদা কাফেরদের প্রতি ক্ষোভ বিরাজ করত। আর মুমিনদের রক্তের ব্যাপারে খুব অনুভূতি সম্পন্ন ছিলেন। মুসলমানের প্রত্যেক ফোঁটা রক্তের থেকে বেঁচে থাকতেন। মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় কাফের মুরতাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় মুসলমানের রক্ত প্রবাহিত হওয়ার খুব সম্ভাবনা থাকে। এমন পরিস্থিতিতে যদি শাইখ রহ. এর মত সতর্কতা না থাকে তাহলে অনেক ভয়ংকর ঘটনা ঘটতে পারে। শাইখ রহ. এব্যাপারে সাথীদের খুব ভালো তরবিয়ত করেছেন। মুসলমানের ক্ষতি হওয়ার আশংকায় অনেক অপারেশনের সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করেছেন!

আমাদের এমন অনেক শত্রু আছে, যারা মাদ্রাসা, মসজিদ, বাজার, গ্রাম - কোন জায়গায় হামলা করতে ছাড়ে না। বন্দিদের হাড্ডি ভেঙে দিতে দ্বিধা করে না। এমন হিংস্র দুশমনের উপর হামলা করার ক্ষেত্রে নিজেকে শান্ত রাখা, উত্তেজনাকর মুহূর্তে শরীয়তের উপর অটল থাকা সহজ বিষয় নয়। কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ শাইখ রহ. এই সমস্ত মুহূর্তে নিজেকে শরীয়তের উপর অটল রেখেছেন। হারাম তো দূরে, সন্দেহজনক বিষয় থেকেও বেঁচে থেকেছেন।

কোন একটি তথ্যে একজন সাথীর উপর ভরসা করতেন না। বরং কয়েকজনের কাছ থেকে খবর নিতেন। শত্রু কোন স্তরের এবং কোন প্রকারের তা খবর নিতেন। সেখানে মুসলমান আছে কি না তা খুব যাচাই করতেন। বারুদ অস্ত্রের পরিমাণ ও কোয়ালিটির হিসাব খুব কঠিনভাবে নিতেন। যাতে ক্ষয় ক্ষতি শুধু টার্গেটের উপর সীমাবদ্ধ থাকে। তিনি আমাকে বলতেন - বর্তমানে বাড়াবাড়ি মুক্ত সতর্ক সাক্ষী খুব কম আছে। এজন্য একজনের কথার উপর ভরসা করবে না। তার এই সতর্ক পদক্ষেপের কারণে আলহামদুলিল্লাহ বিগত সাত বছর যাবত আল কায়দার পাকিস্তানি মুজাহিদরা এমন হামলা খুব কম করেছে, যা শরীয়তে নিষিদ্ধ। তাদের সমস্ত হামলার মূল টার্গেট হলো - পাকিস্তানে অবস্থিত আমেরিকা ও তার ইউরোপীয় জোটের স্বার্থ এবং আমেরিকার সহযোগী পাকিস্তানি সেনা ও গোয়েন্দা ক্যাম্প।

মুসলমানদের একতার জন্য পাগলপারা চেষ্টা

মুসলমানদের এক করার জন্য শাইখ রহ. এর অন্তরে একটি বিশেষ জযবা ও ইচ্ছা ছিল। তিনি ওয়াজির ও মেহসুদ গোত্রের মুজাহিদদেরকে এক প্লাটফর্মে আনার জন্য, আনসার-মুহাজির মুজাহিদদের মাঝে সম্পর্ক মজবুত করার জন্য কয়েক বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন।

শাইখের অনেক সময় মতবিরোধ দূর করা, ঝগড়া মিটানো এবং মানুষের মাঝে ঈমানী ভ্রাতৃত্ববোধ তৈরি করতে ব্যয় হয়েছে। তারই প্রচেষ্টায় শুরা ইত্তেহাদুল মুজাহিদীন গঠন হয়েছে। এই শুরার মধ্যে তেহরিকে তালেবান পাকিস্তানের আমীর বাইতুল্লাহ মেহসুদ শহিদ রহ., ওয়াজিরিস্তানের দুই বড় গোত্র আতমান জাই ও আহমাদ জাই এর জিহাদি নেতৃত্ব, দাউড় গোত্রের জিহাদি নেতৃত্ব এই শুরায় ছিল। আরো আশ্চর্যের বিষয় হলো শুরার সবাই মিলে শাইখ সাঈদ রহ. কে নিজেদের আমীর মেনে নিয়েছিল।

যারা ওয়াজির ও মেহসুদের সাপ-বেজির সম্পর্ক এবং আরব-অনারবের মেজাজ, রুচি-সংস্কৃতির পার্থক্য জানেন তার বুঝবেন যে, এই ঐক্য একটি মুজিযা ছিল। যদিও এই শুরা এক-দেড় বছর ছিল। পরবর্তীতে আমীর বাইতুল্লাহ মেহসুদের শাহাদাতের পর বিভিন্ন পরিস্থিতির কারণে আর শুরা বাকি রাখা সম্ভব হয়নি। কিন্তু এটা শাইখের একটি ঐতিহাসিক কাজ ছিল। এর দ্বারা প্রমাণ হয় যদি একনিষ্ঠ, প্রজ্ঞাবান, নিঃস্বার্থ নেতৃত্ব পাওয়া যায় তাহলে আজও এই উম্মত সমস্ত বিভেদ ভুলে সেই নেতৃত্বের অধীনে এক হয়ে চলবে।

নিঃসন্দেহে আজও এই ধরণের ঐক্য গঠন করা এবং খোরাসানে অবস্থিত মুজাহিদদেরকে সুশৃঙ্খলভাবে গঠিত করে ইমারতে ইসলামিয়ার অধীনে নিয়ে আসা খুবই জরুরী।

গোত্রীয় মুজাহিদরা ছাড়াও শহরের পাকিস্তানি মুজাহিদদের মাঝে সুসম্পর্ক গঠন ও একতা সৃষ্টির দায়িত্বও শাইখ নিয়েছিলেন। তার লাগাতার চেষ্টার ফলে প্রায় ১০টি পাকিস্তানি জিহাদি মজমুয়ার আমীরগণ মেহসুদ এলাকার মাকিন নামক জায়গায় একত্রিত হয়েছিলেন। সেখানে একটি বৈঠক হল। তাতে পাকিস্তানের সমস্ত মুজাহিদদের এক টার্গেট হওয়া এবং পরস্পরে যৌথভাবে কাজ করার

বাস্তবভিত্তিক পদক্ষেপের ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এই বৈঠকটি সম্ভবত ২০০৯ সালের শুরুর দিকে হয়েছিল। তারপর ২০০৯ সালের শেষের দিকে আরেকটি বৈঠক হয়। তাতে শাইখ ফাতেহ (উসমান শিহরী) রহ. ও আরো কিছু মুজাহিদ নেতারা শরীক হন। তারপর ২০১০ বা ১১ সালে আরো একটি বৈঠক উত্তর ওয়াজিরিস্তানের মিরান শাহ এলাকায় অনুষ্ঠিত হয়। এসমস্ত বৈঠক পাকিস্তানের মুজাহিদদের মাঝে সম্পর্ক বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা রেখেছে এবং চিন্তা ফিকিরের এক করার ক্ষেত্রেও অনেক অবদান রেখেছে। আল কায়দা উপমহাদেশ গঠনও এই প্রচেষ্টার ফল।

শাইখ রহ. এর শেষ দুই-তিন বছর এই এক কাজ বাস্তবায়নে কেটেছে। তার একটাই প্রচেষ্টাই ছিল যে, কীভাবে পাকিস্তানের সব মুজাহিদ গ্রুপগুলোকে এক করা যায়। শাইখের মাথায় ছিল যে, সবাইকে ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের অধীনেই এক করা যাবে। এটা জরুরী এবং শরয়ী চাহিদা। কিন্তু আরব অনারবের কয়েক ডজন গ্রুপ এবং বিশেরও অধিক দেশের মুজাহিদদেরকে এক প্লাটফর্মে আনা এত কঠিন ও পাহাড়ের মত ভারী কাজ যে, শাইখ সাঈদের মত হিম্মতওয়ালা, ধৈর্যশীল, সহনশীল, আল্লাহ প্রদত্ত যোগ্যতার অধিকারী ও প্রজ্ঞাপূর্ণ ব্যক্তিরাই এর বাস্তবায়ন করতে পারে।

পুরো ঘর আল্লাহর রাস্তায় কুরবান হয়ে গেছে

শাইখ রহ. সব দলের মুজাহিদদের মাঝে সমান গ্রহণযোগ্য ছিলেন। সবাই তাকে একই রকম সম্মান করত। তার কথা ফেলে দেওয়া সবার জন্য কঠিন ছিল। তার উপস্থিতি সব মুজাহিদদের মাঝে একটি পোল হিসেবে কাজ করত। সবার বিশ্বাস ছিল তার উপস্থিতিতে যদি মতবিরোধ হয়ও তাহলেও তা সীমা অতিক্রম করবে না এবং তিনি জটিল সমস্যারও সহজ সমাধান করে দিবেন। একারণে তার পাকিস্তানে অবস্থান আমেরিকার মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাই সুযোগ পেয়েই তাকে তার পরিবার সহ হত্যা করতে দ্বিধা করেনি। একদিন তার বাসভবনে হামলা করে তাকে, তার স্ত্রী, তার সব মেয়ে, আনসারী কয়েকজন মহিলা সহ মিসাইল নিক্ষেপ করে শহিদ করে দেয়। এরপর তার দুই বড় ছেলেকেও ড্রোন হামলা করে হত্যা করে।

এখানে শাইখ রহ. এর জীবনের আরো কিছু সুন্দর দিক আলোচনা করলে ভালোই হবে।

উত্তম ব্যবস্থাপনার যোগ্যতা

শাইখ রহ. ব্যবস্থাপনায় অনেক যোগ্য মানুষ ছিলেন। তিনি ম্যানেজমেন্ট সাইন্সে পি এইচ ডি করেছিলেন। স্বভাবগত ভাবে তিনি অনেক পরিপাটি মানুষ ছিলেন। সামাজিক বিষয়গুলো খুব গুছালো ভাবে করতে পছন্দ করতেন। তিনি শুধু আল কায়দার জিহাদি গ্রুপগুলোকেই না বরং গোত্রীয় মুজাহিদ গ্রুপগুলোকেও ব্যবস্থাপনা ট্রেনিং করিয়েছেন এবং কাজগুলোকে গুছিয়ে করার পদ্ধতি শিখিয়েছেন। ফলশ্রুতিতে কিছু গোত্রীয় গ্রুপ নিজেদের প্রচলিত পদ্ধতি ছেড়ে শাইখের শিখানো পদ্ধতিতে নিজেদেরকে গঠন করেছে এবং অস্ত্রের স্বল্পতা স্বত্বেও অনেক বড় কাজ সম্পাদন করেছে।

ইলমের পিপাসা

শাইখ শরয়ী ইলমেও যোগ্য ছিলেন। তিনি শাইখ উসামা রহ., আইমান জাওয়াহিরি হা., এবং অন্যান্য আলেম ও জিহাদি ব্যক্তিত্বের সোহবত পেয়েছিলেন। তাই তার মধ্যে ইলমি যোগ্যতা অর্জন হয়েছিল। অনেক মুজাহিদ নেতৃত্ব তার মতামতকে গুরুত্ব দেন। আস সাহাবে প্রকাশিত শাইখের বয়ান ও তালায়ে খোরাসান ম্যাগাজিনে প্রকাশিত শাইখের প্রবন্ধ পড়লে বুঝা যায় শাইখের ইলমি যোগ্যতা কত!

শাইখ ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. ও ইবনুল কায়্যিম রহ. এর প্রতি বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। তাদের কিতাব বেশি মুতালা করতেন। এছাড়া শাইখের কম্পিউটারে অনেক কিতাব ছিল। সেখান থেকেও সময়ে সময়ে মুতালা করতেন। শাইখ আমাকে প্রবন্ধ লিখতে এবং বয়ান করার জন্য উৎসাহিত করতেন। বিশেষ করে হিত্তিন ম্যাগাজিন বের করার প্রতি খুব তাগিদ করতেন। সংখ্যার পনের বিশ কপি নিজের গাড়িতে রাখতেন এবং প্রয়োজন মত লোকদেরকে দিতেন।

দাওয়াতের প্রতি আগ্রহ

শাইখ রহ. এর অন্তরে দাওয়াতের খুব আগ্রহ ছিল। অনেক সময় শাইখ পাকিস্তানের উল্লেখযোগ্য মাদ্রাসার উলামায়ে কেরাম ও দ্বীনি জামাতের নেতাদের নামে দাওয়াতি চিঠি লিখে আমাদের হাতে দিতেন পৌঁছে দেওয়ার জন্য। নিজেও গোত্রীয় এলাকায় দ্বীনি কাজের প্রসার, অন্যায় দূরীকরণ, জিহাদের দাওয়াত প্রচারের কাজে লিপ্ত থাকতেন। যেখানেই বসতেন সেখানেই দাওয়াত ও তাবলীগের কিছু না কিছু কাজ করতেন। যার সাথেই দেখা করতেন তাকেই কিছু নসিহত করতেন। ইবাদত করার প্রতি উৎসাহিত করতেন। জিহাদের সাথে সম্পর্ক করার তাগিদ দিতেন। মাঝে মাঝে অন্যান্য দলের মুজাহিদ নেতাদেরকে নিয়েও এরকম বৈঠক করতেন। সেখানে শুধু দ্বীনি দাওয়াত ও তরবিয়তের আলোচনাই করতেন। জিহাদ বা সামাজিক বিষয়গুলো উল্লেখ করতেন না।

এরকম দুইটি দাওরা করার সুযোগ আমার হয়েছে। একটিতে ছিলেন শহিদ বাইতুল্লাহ মেহসুদ রহ., তার ডান হাত মাওলানা ওয়ালিউর রহমান শহিদ রহ. এবং তাদের কিছু নিকটতম সাথী। এই দাওরা দুইদিন ব্যাপী হয়েছিল। আল কায়দার পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন শাইখ আবু ইয়াহয়া, শাইখ আতিয়াতুল্লাহ, শাইখ খালেদ হাবিব, শাইখ জুবায়ের সরবলন্দ সহ আরো কিছু শাইখ। অনুবাদ আমি করেছি। গণতন্ত্র ও জিহাদের অনেক ইলমি আলোচনা হয়েছে।

শাইখ মেহসুদ এলাকায় আমর বিল মারুফ নাহি আনিল মুনকার বিভাগ প্রতিষ্ঠা করার উপর গুরুত্বারোপ করলেন। শাইখ বারবার উৎসাহ দেওয়াতে মেহসুদে পাকিস্তানের হামলার কয়েক মাস পূর্বে আমীর বাইতুল্লাহ মেহসুদ নিজেই এই বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন। মেহসুদ এলাকাকে বিভিন্ন জোনে ভাগ করে একেক এলাকায় একেকজন আলেমকে এই দায়িত্ব দেন। শুরুতে এই কাজ মুজাহিদদের মাঝে চালু করলেন। দ্বীনের উপর চলা, নামাজের গুরুত্ব দেওয়া, কিছু প্রচলিত বেদআতকে পরিত্যাগ করা, বিচার ফয়সালা শরীয়ত অনুযায়ী করা ইত্যাদির উপর জোর দেওয়া হয়। পাকিস্তানের হামলার পরেও এই বিভাগ চালু ছিল এবং মুজাহিদদের হিজরত অবস্থায়ও চালু ছিল। এখন পর্যন্ত এই বিভাগ চালু আছে। আশা করি আল্লাহ চাইলে এই আমল শাইখ সাঈদের একটি সদকায়ে জারিয়া আমল হিসেবে গণ্য হবে।

স্থানীয় মুজাহিদদের সংশোধনের চেষ্টা

এমন একটি কোর্স উত্তর ওয়াজিরিস্তানের স্থানীয় মুজাহিদদের নিয়েও হয়েছিল। তিন দিন ব্যাপী ছিল সে কোর্স। সেখানেও আমি অনুবাদক ছিলাম। শাইখ আবু ইয়াহয়া লিবি রহ. জিহাদ ও তাওহিদ সম্পর্কে খুব সুন্দর একটি বয়ান করেছিলেন। শাইখ সাঈদ রহ. তাজবিদ পড়ালেন এবং ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে একটি দরস দিলেন। শাইখ খালেদ হাবিব রহ. যুদ্ধের কৌশল সম্পর্কে নিজের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার আলোচনা করলেন। শাইখ আতিয়াতুল্লাহ রহ. তাজকিয়া সম্পর্কে দরস দিলেন। অন্যান্য শাইখগণও বক্তব্য রেখেছেন। নামাজের ইমামতি উত্তর ওয়জিরিস্তানের আমীর সাহেব করতেন।

একটি উল্লেখযোগ্য কথা হলো শাইখ সাঈদ রহ. সহ সব শাইখগণ স্থানীয় মুজাহিদদের মনোতুষ্টির জন্য হানাফি মাজহাব অনুযায়ী নামাজ পড়েছেন। অজু করেছেন। ইকামত দিয়েছেন। শহিদ বাইতুল্লাহ মেহসুদ রহ. এর ওখানের কোর্সেও এই আমল করেছেন। নিশ্চয় আনসার মুজাহিদদের মাঝে সম্পর্ক বৃদ্ধিকরণে এবং বিভিন্ন মাযহাবের লোকদেরকে এক শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য এক করায় আল কায়দার ইলমি আমলি এই হৃদয়ের প্রশস্ততা, উঁচু দৃষ্টি এবং ইসলামের সঠিক বুঝের অনেক বড় অবদান রয়েছে। নিশ্চয়ই এই কার্য পদ্ধতি উম্মতের নেতৃত্ব দানকারী সমস্ত ব্যক্তিবর্গ বিশেষ করে জিহাদের আমীরদের জন্য অনুসরণ যোগ্য।

সাহস ও বাহাদুরি

এই দাওয়াতি দরদের সাথে শাইখ রহ. অনেক সাহসের অধিকারী ছিলেন। শাইখের এই দিকটি আমরা বেশি বুঝতে পেরেছি যখন পাকিস্তান আর্মি মেহসুদে হামলা করেছে। তখন শাইখ রহ. বাইতুল্লাহ মেহসুদের সাথে বারবার সাক্ষাত করতে লাগলেন। তার সাথে সাক্ষাত করে রণাঙ্গন নির্ধারণ করা, যুদ্ধ পরিকল্পনা করা, এবং যুদ্ধ প্রস্তুতি বাড়ানোর প্রতি উৎসাহিত করতে লাগলেন। শাইখ রহ. এই যুদ্ধে আর্থিক, সামরিক এবং সৈন্য দিয়ে সাহায্য করেছেন। মেহসুদি মুজাহিদদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়িয়েছেন।

ঐ সময় জেট বিমানের খুব হামলা হচ্ছিল। তাই সমস্ত সাথীরা বারবার বলছিল শাইখ যেন মেহসুদ ছেড়ে উত্তর ওয়াজিরিস্তানে চলে যান। কিন্তু শাইখ স্থল হামলা

করা পর্যন্ত সেখানেই ছিলেন। তিনি মাকিন বরওয়ান্দ এলাকায় গিয়ে যুদ্ধ ক্ষেত্র পরিদর্শন করেছেন। সাথীদের গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিয়েছেন। পাকিস্তানি সৈন্যদেরকে বাঁধা দেওয়ার জন্য মাইন বিছানো এবং রাস্তায় বাঁধা সৃষ্টির ব্যবস্থা করেছেন। মেহসুদে মুজাহিদদের হাসপাতালের প্রয়োজন পূরা করেছেন। মেহসুদের এক মাথা থেকে অন্য মাথা পর্যন্ত চষে বেড়িয়েছেন।

অনেক বার বিমানের নিক্ষিপ্ত মিসাইল তার নিকটে এসে পড়েছে। তখন সাথীরা সেই অবস্থায় তার প্রশান্ত চিত্ত দেখে আশ্চর্য হয়ে গেছে।

দুনিয়া বিমুখতা ও অমুখাপেক্ষিতা

শাইখের জীবনের আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো - দুনিয়া বিমুখতা। আমরা তাকে সর্বদা দুনিয়া থেকে দূরে পেয়েছি।

শাইখ আতিয়াতুল্লাহ রহ. বলেন, আমি যখন ইরান সফর করে আসলাম তখন সাথীরা আমার ও পরিবারের জন্য একটি সংকীর্ণ ছোট ঘর থাকার জন্য দিয়েছিল। আমি চিন্তা করছিলাম এই ঘরে তো ভালোভাবে আরামও করা যায় না। শাইখ সাঈদ এবং অন্যান্য শাইখরা মনে হয় খুব ভালো ঘরে বাস করেন। একদিন আমাকে শাইখ সাঈদ রহ. তার ঘরে নিয়ে গেলেন। আমি দেখলাম তিনি একটি ছাগল থাকার ছোট অন্ধকার খোপকে পরিষ্কার করে থাকার জায়গা বানিয়েছেন। এই অবস্থা দেখে আমি মনে মনে খুব লজ্জিত হলাম এবং আস্তাগফিরুল্লাহ পড়লাম।

তেমনিভাবে আরেক বার গরমের মৌসুমে, দুপুরে প্রচণ্ড গরমের মধ্যে আমি গাড়ি নিয়ে একটি কাজে বের হলাম। দেখি রাস্তার এক পাশে শাইখ সাঈদ রহ. এর গাড়ি দাঁড়ানো আছে। আমি গিয়ে তার গাড়িতে উঠলাম। উঠে দেখি তিনি ঘামে একদম গোসল হয়ে গেছেন। তার গাড়ির এসি নষ্ট ছিল। তিনি কারো জন্য অপেক্ষা করছিলেন। কেউ চিনে ফেলার আশংকায় গাড়ির কাঁচও খুলছিলেন না। আমি তাকে এই গরম উপেক্ষা করে জিহাদি কাজে ব্যস্ত দেখলাম। নিঃসন্দেহে আমরা তাকে কখনও আরাম প্রিয় দুনিয়ালোভী পাইনি।

আর নিশ্চয়ই যে দুনিয়া পরিত্যাগ করেন, তাকে দুনিয়ার লোভ বা ভয় দেখানো সম্ভব হয় না।

প্রভাব প্রতিপত্তি

শাইখের এসমস্ত গুণের কারণে আল্লাহ তাকে এক বিশেষ ধরণের প্রভাব দান করেছিলেন। শাইখের মায়া-মমতা, দয়া-মহব্বত স্বত্বেও তার সামনে জড়সড় হয়ে বসতে হত। হিসেব করে কথা বলতে হত। প্রভাব আল্লাহর দান। আল্লাহ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দান করছিলেন। যে ব্যক্তি যত বেশি সুন্নতের অনুসারী হবে তার প্রভাবও আল্লাহ তেমন দান করবেন। শাইখ সাঈদ রহ. এর প্রভাব কেমন ছিল তা বুঝার জন্য একটি উদাহরণ দিই।

একবার এক টিভি সাংবাদিক ও করাচী প্রেস ক্লাবের পরিচালক শাইখের একটি সাক্ষাতকার নেওয়ার জন্য আসল। শাইখের এটা প্রথম টিভি সাক্ষাতকার ছিল। সাংবাদিক অনেক পুরনো ছিল। হওয়া উচিৎ ছিল যে, সাংবাদিক স্বাভাবিক থাকবে আর শাইখের একটু ভয় ভয় লাগবে। কিন্তু শাইখ খুব স্থির ছিলেন। কিন্তু সাংবাদিক শাইখের সামনে কাপাকাপি শুরু করে দিয়েছিল। তখন আমার সাথে শহিদ মুসআব ভাইও ছিলেন। এ-দৃশ্য দেখে সালাফদের এ কথা বুঝে আসল যে, "তুমি আল্লাহকে যতটুকু ভয় করবে, মানুষ তোমাকে ততটুকুই ভয় করবে"।

সর্বশেষ সাক্ষাত

শেষ সময়ে এসে শাইখ আমাকে সাথে রাখতে লাগলেন। বাড়িতে নিয়ে যেতেন। তার সাথে থাকা মুহূর্তগুলো এমন স্বাদের ছিল যে, কিছুদিন তার সাক্ষাত না পেলে মন কেমন করত। তাকে দেখলেই মনে প্রশান্তি আসত। শাইখও আমাকে দেখে মুচকি হাসতেন। ঘুমালেও আমরা একে অপরকে স্বপ্নে দেখতাম। একবার আমাকে তিনি বললেন, "আমি স্বপ্নে দেখলাম তুমি আমার কাছে মুজাহিদদের মাঝে সম্পর্ক কম হওয়ার অভিযোগ করে কাঁদছ"। এরপর তিনি মুচকি হেঁসে বললেন, "আল্লাহ তোমার এই দরদকে কবুল করুন। মুজাহিদদের মাঝে একতা তৈরি করে দেন"।

শাইখের সাথে শেষ সাক্ষাত হয়েছিল উত্তর ওয়াজিরিস্তানের 'বুইয়া' নামক একটি জায়গায় এক আনসারীর ঘরে। (হায়! আমি কি তখন জানতাম যে, এর কিছুদিন পরেই শাইখ আরেক আনসারীর ঘরে শহিদ হয়ে যাবেন!)। আমার কাছে অনেক প্রশ্ন জমা ছিল। আমি শাইখের সাথে দুই দিন ছিলাম। দ্বিতীয় দিন আসর থেকে রাত একটা পর্যন্ত শাইখের কান ঝালাপালা করেছি। শাইখ প্রচণ্ড ক্লান্ত থাকা

স্বত্বেও হাস্যজ্জ্বল চেহারায় ধৈর্য সহকারে আমার সমস্ত কথা শুনেছেন এবং উত্তর দিয়েছেন। আমার কিছু ভুল শুধরে দিয়েছেন।

একটি সন্দেহপূর্ণ জায়গায় হামলা করার কথা ছিল, শাইখ নিষেধ করলেন। নবীনদের লাগাম এমন বিচক্ষণ বুজুর্গদের হাতে থাকা উচিৎ যাতে জোশ-হুশের মাঝে সমতা বজায় থাকে। আমি উযবেক ভাইদের একটি গ্রুপের সাথে ইখতিলাফ দূর করার জন্য শাইখকে পদক্ষেপ নিতে বললাম। শাইখ গ্রহণ করলেন এবং আমার সাথে কিছু বিষয়ে একমত হলেন। রাত যখন একটা বাজে তখন আমার কথা শেষ হল। শাইখেরও ঝিমুনি আসছিল। তখন তিনি মমতার সাথে বললেন, “আমাদের কথা কি শেষ? একটু ঘুমাব না!”

এটাই আমাদের শেষ বৈঠক ছিল। শাইখ তাহাজ্জুদের সময় উঠে গেলেন এবং সবাইকে জাগিয়ে দিলেন। ফজরের পর আমি বিদায় নিয়ে ওয়ানা চলে আসলাম।

একটি বটবৃক্ষের কর্তন

ওয়ানা পৌঁছার দুই দিন পরেই শাইখের হৃদয় বিদারক শাহাদাতের সংবাদ শুনলাম। চোখের পানি থামাতে পারলাম না। আল্লাহই ভালো জানেন এই উম্মতের কত সন্তান এক দয়াশীল পিতা হারিয়ে ফেলেছে।

তার শাহাদাতের পর শাইখ উসামা বিন লাদেন রহ. শাইখ আতিয়াতুল্লাহর কাছে একটি চিঠি পাঠিয়ে ছিলেন। তিনি লিখেছেন, “আমি প্রথমে আমাকে ও আপনাদেরকে সান্ত্বনা দিচ্ছি। আল্লাহ আমাদের ভাই শাইখ সাঈদকে রহমত দান করুন। আর তিনি যে শাহাদাতের মাকাম আশা করতেন তা আল্লাহ তাকে দান করুন। তার ধৈর্য ও সহনশীলতাকে নেকির পাল্লায় রাখুন।

তিনি শুধুমাত্র আল্লাহর দ্বীনের সাহায্যের জন্য জিহাদের ময়দানে ত্রিশ বছর কাটিয়েছেন। আমরা তার ব্যাপারে এমনই ধারণা রাখি। আল্লাহই আসল হিসাব গ্রহীতা। তিনি ওয়াজিরিস্তানে শত্রুদের হিংস্র হামলার যথাযথ মোকাবেলা করেছেন। সব ধরণের অবস্থায় অবিচল ছিলেন। ধৈর্য সহকারে কাজ করেছেন। আল্লাহর ফয়সালার উপর সন্তুষ্ট ছিলেন।

শুধু এতটুকু নয় বরং তিনি আল্লাহর রাস্তায় কষ্ট করার মাঝে শান্তি পেতেন। তিনি কখনও অভিযোগ করতেন না। এই রাস্তায় নিজে ও নিজের প্রিয়দের জীবনকে

কুরবান করেছেন। আমরা তার ব্যাপারে এমন ধারণা করি, আল্লাহর সামনে অন্য কারো পবিত্রতা বর্ণনা করি না। ”

শাইখ তো আমাদের থেকে পৃথক হয়ে গেছেন। কিন্তু আমাদের মন থেকে তিনি পৃথক হননি। এমন চমৎকার চরিত্রের মানুষ, এমন উম্মতের দরদি, এমন পরিচ্ছন্ন মনের অধিকারী মানুষের দেখা আর কোনদিন পাব কিনা কে জানে?

আল্লাহ তার শাহাদাতকে কবুল করুন। তার সাথে জান্নাতে থাকার তাওফিক দান করুন। তার মত মুহসিন মানুষের কদর করার তাওফিক দান করুন। আমীন।

****